তখন ও এখন

গীতা দাস

(৭)

গ্রাম --- গাছ -গাছালি --- পাখ -পাখালি – এখনো আমার মন পাখালিকে বুদ করে রাখে। ছোট বেলায় আমরা হাঁস পুষতাম। এখনকার মত অষ্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, মুনিয়া,... ... খাঁচায় পোষার মত শুধু শখে নয়। শখ ও প্রয়োজন দুটোই মিটত। হাঁসের ডিম বেচা হত না। আমরা ছোটরা খেতাম, রাতে বিরাতে অতিথি এলে মাঝে মাঝে তরকারি রান্না হত। সকালে নদীতে ভাসিয়ে দিতাম। সন্ধ্যায় তই তই করে ডেকে বাড়িতে নিয়ে আসতাম। তবে ভরা বর্ষায় বাড়িতেই টিউবওয়েলের কাছে রাখা হত, কারণ বর্ষার জলে হাঁসের ভেসে যাওয়ার ভয়। বর্ষাকাল ছাড়াও মাঝে মাঝে দুই একটা হারিয়েও যেত। তখন আমার ঠাকুমারা বলতেন ----

‘কৈতর পালে নাগরে
হাঁস পালে অন্ধে
রাইতে না ফিরলে
দুয়ার অ বইয়া কান্দে।’

কৈতর অর্থাৎ কবুতর পুষে নাগরে মানে নাগরিকে--- ভদ্রলোকে। কিন্তু হাঁস পাললে অন্ধের মতই থাকতে হবে। সন্ধ্যায় না ফিরলে কান্নাকাটি ছাড়া কিছু করার নেই।

খাঁচায় ময়না, টিয়া পোষা হত গ্রামের দু’একটি বাড়িতে। এছাড়া আমরা পাখি দেখতাম মুক্তাবস্থায়। পোষা পাখির মতই দরদ ছিল সে সব পাখির প্রতি। কোন বাঁশ গাছের আগার বাসায় কয়টি বকের ছা তা মুখস্থ ছিল আমাদের পাড়ার এক ছেলের। সে বকের মাংসও খেত।

আমার কখনো সে সাধ হয়নি। ছেলেটিকে মানা করেও তার বকের মাংস খাওয়া বন্ধ করতে পারিনি। ছোটবেলায়ই তার মা মারা যাওয়ার পর আমাদের কয়েক জনের ধারণা হয়েছিল সে বকের ছানাদের মা খায় বলেই তার মা মারা গেছে। যদিও অন্য অনেকেরই মা বা বাবা মারা গিয়েছিল, যারা বকের ছানাদের মা বা বাবা খায়নি, তবুও ঐ ছেলেটির বেলায় কেন জানি এমন ধারণা হয়েছিল।

আমাদের চৌচালা ঘরের কার্ণিশে ছিল চড়ুই পাখির বাসা। চড়ুই পাখির ঘুম ঘুম চোখ খুব উপভোগ করতাম। মনে হত এই মাত্র বুঝি ঘুম থেকে উঠে এসেছে। নারকেল গাছে বাবুই পাখির বাসা গণনা করতাম। যাদের গাছে বাবুই পাখির বাসা বেশি তারা গর্ব বোধ করতাম। আমাদের কাঠের দোতালার কারে (সিলিং) এক ঝাঁক জালালী কবুতর বাসা বেঁধেছিল। পায়খানা করে দোতালার কাঠের বারান্দা ভরিয়ে ফেলত, তবুও তাড়ানো হত না। কারণ ধারণা করা হত ওগুলো ছিল সৌভাগ্যের প্রতীক।

আমাদের বাংলা ঘরের পেছনের আম গাছে প্রায়ই বসে থাকা ঘুঘু পাখি দুটিকে বড় আপন মনে হত। পাখি দুটি তাদের গলার কাল দাগে কারও শোক চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হত। বাড়ির বাইরের ঘরকে বাংলা ঘর বলতাম। ঐ ঘরে আমাদের লজিং মাষ্টার অধীর কাকা থাকতেন।

আমাদের ঘরের পেছনে গর্তের ঝোঁপে কয়টি ডাহুক থাকত। ওরা প্রায়ই গলা ফাটিয়ে ডাকত। মনে হত যেন বিলাপ করছে।
এখন বার্ড ফ্লুর তাপে ঐসব পাখিদের দরদী কে? কে তাদের রক্ষা করবে কে জানে!
আর শহুরে জীবনে পাখি দেখা! বারান্দায় খাবারের কিছু শুকাতে দিলে শুধু কাক দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্র লালের --- 'তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে

পরে পাখির ডাকে জাগে' হয়ে গেছে 'আমরা গাড়ির শব্দে ঘুমিয়ে পরি, এলার্ম বাজায় জাগি'। হ্যাঁ, শহুরে জীবন ঘড়ির এলার্ম শুনে অথবা ছোটা কাজের বুয়ার কলিং বেলে জাগে।

'তোমার মত কারো ছোঁয়া বৃক্ষ যদি পায় । বৃক্ষ তবে সবুজ হয়ে যায়' – হ্যাঁ, সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা স্মরণ করে বলতে হয় গাছ-গাছালি আমাদের আন্তরিক, আবেগীয়, আপ্লুত ছোঁয়া পেয়ে সবুজ হত আর আমরাও গাছ-গাছালির ছায়ায় আপদবিহীনভাবে বেড়ে উঠেছিলাম।

গাছ – গাছালিতে ঘেরা ছিল আমার তখনকার যাপিত জীবন। ঘরের কোণায় বৌ সেজে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত কলা গাছ। সামান্য সীম ফুলের সৌন্দর্যেও মুগ্ধ হতাম। সীম ও বেল দুটো গাছেরই পাতা তিনটি এক সাথে গাঁথা। মনে হত যেন ত্রিভূজ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ তাদের জীবন।

সারি সারি সুপারি গাছের কারি কারি পাতা। কিন্তু সে পাতার আগা চুল ছাঁটার মত করে কাটা। কোন নরসুন্দর যেন সুপারি গাছের পাতা ছেঁটে দিয়েছে। চিত্রকল্পের সমাহারে পরিপূর্ণ ছিল চারপাশ।

এখন টবে লাগানো পাতা বাহার। অর্কিড। সকালে একটু জল দিয়ে তৃপ্তিবোধ করি। বিকেলে আধটু হাত বুলিয়ে স্বস্তি ভাব ধরি।

বর্ষাকালে সবুজ রঙের এক ধরণের ছোট ছোট পোকাকে ময়না বলতাম। ওগুলো ধরে দেয়াশলাই বাক্সে ভরে রাখতাম ডাটা পাতা খাবার হিসেবে দিয়ে। সারাদিন থাকত, কিন্তু সকালে উঠে দেখতাম নাই। একটু সাময়িক কষ্ট হত – আবার ভুলেও যেতাম।

কাফিলা গাছের আঠা বাঁশের থাপের আগায় লাগিয়ে ফড়িং ধরতাম। ফড়িং এর পাখায় দূর থেকে বাঁশের থাপের আগায় লাগানো আঠা ছোঁয়াতে পারলেই ফড়িংটি ধরা পড়ত। পরে সূতায় বেঁধে খেলা

হত। এ খেলাটি আমার বেশি পছন্দ ছিল না, তবুও জেঠতুতো ভাইদের সাথে --- ফড়িং এর পেছন পেছন ঘোরের মধ্যে দৌড়াতাম। আজকালকার কিছু জঙ্গিও কী তখনকার আমার মত এখন ঘোরের মধ্যে দৌড়ায়!

কাফিলা আঠা দিয়েই ছেঁড়া বই জোড়া লাগাতাম। বইয়ের মলাট লাগাতাম। বাজারের গামের পটের উপর নির্ভরশীল ছিলাম না।

কয়েক মাস আগে আমার বারান্দায় একটি টবে লাগানো গাছে বাইশটি মরিচ ধরেছিল। কামরাঙা মরিচ। অন্তত বারজনকে বারটা বিলিয়েছি। কেউ কেউ একটিমাত্র মরিচ উপহার পেয়ে মনে মনে নিশ্চয়ই আমাকে অসঙ্গত কিছু একটা ভেবেছে। তবে আমি কিন্তু আমার সৃষ্টিকে অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়ার পরিপূর্ণ আনন্দটুকু উপভোগ করেছি। তা ছাড়া আমার ছোটবেলায় দেখতাম গাছের আম বা লাউ বিলিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ। এমন কি গাই বিয়ালে পর্যায়ক্রমে আশেপাশের প্রতিবেশি ও আত্মীয় বাড়িতে দুধ বিলি চলত। এখনও সেই ঐতিহ্য চর্চার সুযোগ যখন এলোই তখন আর সুযোগ হাত ছাড়া করি কেন।!

এ দেয়া নেয়ার চর্চা,অভ্যাস, সামাজিকতা,সহযোগী মনোভাব উবে গেছে ---- বাস্প হয়ে গেছে।

ছোটবেলায় নিমের বা মটকিলা গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতাম। টুথ ব্রাশ পেষ্ট বেশ বড় হয়ে শুরু করেছি। পাশের ঝুপ ঝাড় থেকে মটকিলা গাছ মাপ মত ভেঙ্গে নিয়ে আনতাম। সাথে তেতো, মিষ্টি ও কষ মিশ্রিত মটকিলার ফলও চেখে আসতাম। অথবা মাঝে মাঝে আমাদের বাংলা ঘরের সামনের নিম গাছে উঠে কেউ বড় ডাল পাড়ত। বড় ডাল থেকে আমরা সুবিধা মত যে যার মাপের ডাল কেটে বা ভেঙ্গে নিতাম। আর এখন! বাজার ঘুরে নরম ব্রাশ কিনি সাথে বিশেষ পছন্দের পেষ্ট। যাপিত জীবন সময়ের চাকায় রূপ বদলায়, অভ্যাস পাল্টায়, পরিব্র্তনের

বাতাসে কখনো উর্ধ্বমুখী আবার কখনো বা নিম্নমুখী। প্রাকৃতিক ডাল রেখে কৃত্রিম টুথ ব্রাশ পেষ্ট ব্যবহার উর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী তা অবশ্য আমি জানি না এবং ভেবেও পাই না।

আমার কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহের শখ ছিল। এর মধ্যে একটি হল পোয়া মাছের দাঁত সংগ্রহ। এ নিয়ে মায়ের প্রবল আপত্তি ছিল। বকাও খেয়েছি অনেক। গতানগতিক হিন্দু পরিবারে যা হয় আরকি, শকরা পাতের জিনিস নিয়ে কোথায় না কোথায় রাখব! নিজের পাতের পোয়া মাছের মাথা থেকে তো দাঁত সংগ্রহ করতামই, পরিবারের অন্যান্যদের পাত থেকেও করতাম। ভাল করে ধূয়ে একটা সাদা বোতলে ভরে রাখতাম। আবার কখন যে কোন ফাঁকে হারিয়েও ফেলতাম। এমন কত স্মৃতিও তেমন করে হারিয়ে ফেলেছি।

গীতা দাস
ঢাকা
২৫বৈশাখ/১৪১৫/ মে ২০০৮
grdas2006@yahoo.com